জঙ্গল

©

বারোমাসি প্রকাশনী

জঙ্গল

সরওয়ার পাঠান

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ :

লেখক ও প্রকাশকের যৌথ অনুমতি ব্যতীত এই বই বা বইয়ের কোনো অংশবিশেষ ই-বুক বা অনলাইনে প্রকাশ করা যাবে না এবং কোনো যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই ঘোষণা লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বারোমাসি প্রকাশনী

প্রকাশক

মিঁয়া মোহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ ফয়সল

জঙ্গল

সরওয়ার পাঠান

গ্রন্থস্বত্ব©নাদিয়া খানম

প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৪৩১

ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

শাবান, ১৪৪৬

প্রচ্ছদ : সাহাদাত হোসেন

JUNGLE

SARWAR PATHAN

Copyright @Nadia Khanom

মুঠোফোন : ০১৯৭১ ৬১ ১২ ১২

অক্ষরবিন্যাস, অলংকরণ :

বারোমাসি

মুদ্রাক্ষরিক : বারোমাসি

মুদ্রণ : রিমা ট্রেড, ৪১২/বি, গাউসুল আজম সুপার মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র : বারোমাসি, নাগড়া ফুটব্রীজ, নেত্রকোনা

বিক্রয়কেন্দ্র ১ : বারোমাসি, কদম খাঁ গলি, মিতালি রোড, ঝিগাতলা, ঢাকা

বিক্রয়কেন্দ্র ২ : বারোমাসি, বাড্ডানগর লেন, হাজারীবাগ পার্ক সংলগ্ন, ঢাকা

বিনিময় মূল্য : তিনশ' বিশ টাকা মাত্র **US : $4**

ISBN: 978-984-99551-2-2

ঘরে বসে, কম খরচে এবং বিভিন্ন প্যাকেজ ও বাহারি ছাড়ে যেকোনো প্রকাশনীর বই কিনতে যোগাযোগ :

www.facebook.com/baromashi

www.facebook.com/baromashiprokashoni

উৎসর্গ

ডাক্তার মাহফুজা পাঠান রুমা—
আদরের ছোট বোন

সূচি

মাতাঙ্গা/ ০৯
চান্দু/ ২৬
দুঃসাহসী মুঙ্গীয়া/ ৩৭
শেষ শিকার/ ৫১

মাতাঙ্গা

রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিয়ে দ্রিম দ্রিম শব্দে বেজে উঠল ঢাক, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো বিশাল আগুনের কুন্ড। আগুনের কুন্ডের পাশে খুঁটিতে বাঁধা রয়েছে একটা গরু। এটাকে ঘিরে বল্লম হাতে নেচে চলেছে একদল অর্ধউলঙ্গ মানুষ। একটু পর পর তাদের হাতের বল্লমের খোঁচা পড়ছে গরুর দেহে, ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসছে রক্ত। দেখতে দেখতে বল্লমের খোঁচায় রক্তাক্ত হয়ে উঠল গরুটার সারা শরীর। তবুও তাদের আঘাতের কোন বিরাম নেই। তারা জানে গরুটা সহজে মরবে না। কারণ তাদের অদ্ভুত বল্লমের ফলাগুলো খুব ছোট। তারা চায় রক্ত ঝরে তিলে তিলে যাতে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় গরুটা। আমি আর মৃদুল একটা বাঁশের তৈরি খাটিয়ায় বসে দেখছিলাম অদ্ভুত উৎসবের নারকীয় দৃশ্যগুলো। না, এটা আফ্রিকার কোন গহীন অরণ্যের নরমুন্ড শিকারী বা নরখাদকদের উৎসব নয়।

এ উৎসব চলছে বান্দরবান জেলায়!

গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া সাংগু নদীর তীরের বেতাঙ্গী পাহাড়ের মাথায়। এই পাহাড়ের মাথায় রয়েছে আদিবাসী মুরংদের গ্রাম। মুরং'রা আমাদের দেশের অন্যান্য আদিবাসীদের চাইতে একটু বেশি বুনো স্বভাবের। এক শতাব্দী আগে মুরং'রা বসবাস করত গাছের মাথায়। গায়ে কাপড় পরায় অভ্যস্ত ছিল না। সভ্যতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এক সময় তাদের জীবনেও পরিবর্তন আসে। গাছ থেকে নেমে মাটিতে বসবাস শুরু করে তারা। বন্যপ্রাণী শিকারই ছিল তাদের একমাত্র পেশা। এরপর এক সময় শিকারের পাশাপাশি তারা শুরু করে জুম চাষ। বসবাসের ঘর তৈরি করার আগে মাটির উপর বাঁশের খুঁটি পুঁতে মাচা তৈরি করে তারপর সেই মাচার উপর ঘর নির্মাণ করে। মাচার উপরে তৈরি মুরংদের ঘরগুলো দেখলেই বোঝা যায় গাছের উপরে বসবাসের স্মৃতি এখনো তারা ভুলতে পারেনি। খুব বেশি প্রয়োজন না হলে তারা পাহাড়ের নিচে নামে না। সমতলের মানুষ কিংবা অন্যান্য আদিবাসীদের এড়িয়ে চলতে পছন্দ করে তারা। মুরংদের নির্দিষ্ট কোন ধর্ম বা ধর্মীয় অনুশাসন নেই। আর এজন্য তারা দায়ী করে গরুকে।

কথিত আছে, সৃষ্টিকর্তা মানুষ সৃষ্টি করার পর সব মুরং'রা মিলে একটা গরুকে বিধাতার কাছে পাঠায় তাদের ধর্মীয় অনুশাসন জানার জন্য। সৃষ্টিকর্তা কলাপাতার উপরে ধর্মীয় অনুশাসনের নিয়ম লিখে গরুর মুখে তুলে দেন। কিন্তু, সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে ফিরে আসার সময় গরুর হঠাৎ ভীষণ ক্ষিধে পায় এবং সৃষ্টিকর্তার আদেশ লেখা কলাপাতাটি খেয়ে ফেলে। মুরং'রা গরুর এই কাজে ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়। সেই থেকে শুরু হয় তাদের বাৎসরিক গো-হত্যা উৎসব। এমনি এক গো-হত্যা উৎসবের ঠিক আগের দিন আমরা এসে পৌঁছেছি এই গ্রামে। শান্তি বাহিনীর ভয়কে উপেক্ষা করে অনেক দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে আমরা এসেছি বাংলাদেশের সবচেয়ে দুর্লভ জাতের হরিণ *মাউস*

ডিয়ার-এর ছবি তোলার আশায়। এ পর্যন্ত কেউ এই প্রজাতির হরিণের ছবি তুলতে পারেনি। আমরা খবর পেয়েছিলাম সাংগু নদীর দুই তীরের গভীর অরণ্যে এখনও টিকে আছে 'মাউস ডিয়ার'রা আর তাদের খবর জানে একমাত্র বুনো আদিবাসী মুরং'রা।

গ্রামে পৌঁছেই আমরা দেখা করি বৃদ্ধ গ্রাম-প্রধান 'মাতাঙ্গা ম্রো'-এর সঙ্গে। 'ম্রো' হচ্ছে মুরংদের বংশের উপাধি। তাকে সবকিছু খুলে বলার পর আমাদের সব রকমের সাহায্য করার আশ্বাস দেয়। অন্যান্য মুরংদের মত বৃদ্ধের মাথার পেছনেও রয়েছে কাঁচা-পাকা চুলের একটা বিশাল বেনী।

আমরা পরদিন গ্রামপ্রধান সহ কয়েকজন মুরং'কে নিয়ে জঙ্গলে ঘুরতে যাওয়ার পর তাদের কাছ থেকে জানতে পারলাম, আজ রাতে তাদের গ্রামে বিশাল এক উৎসব হবে। মাতাঙ্গা, বৃদ্ধ গ্রামপ্রধান, আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানালো উৎসবে যোগ দেয়ার জন্য। কিন্তু এই উৎসবে যে এত পরিমাণ ভয়াবহতা ও নির্মম দৃশ্য দেখতে হবে, তা আমরা কল্পনা করতে পারিনি। বল্লমের ফলার শত শত আঘাতে রক্ত ঝরে দুর্বল হয়ে পড়া গরু'র দেহটা একসময় মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। এরপরও থামলো না উন্মত্ত মুরংরা। অসহায় একটা প্রাণীর উপর এই কল্পনাতীত নির্মম আচরণ আমরা আর সহ্য করতে পারলাম না। মাতাঙ্গার থেকে বিদায় প্রার্থনা করে আমাদের ঘুমাবার জন্য নির্ধারিত ঘরটিতে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

সকালে ঘুম ভাঙ্গল গ্রাম প্রধানের ডাকে। ট্রাভেলিং ব্যাগ থেকে বিস্কুট বের করে দ্রুত নাস্তা সেরে নিলাম। ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলাম। আমার সঙ্গে রয়েছে আমার প্রিয় নাইকন এফএম-টু ক্যামেরা, মৃদুলের কাঁধে ঝোলানো নাইকন এফজি। এই দু'ধরনের ক্যামেরাই ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফীর জন্য দারুণ উপযোগী। ক্যামেরাগুলোতে লাগানো আছে লং রেঞ্জের শক্তিশালী টেলিফটো লেন্স।

অন্যদিকে, মাতাঙ্গার সঙ্গে রয়েছে কয়েকজন মুরং শিকারী। তাদের কারো হাতে তীর-ধনুক, কারো হাতে বল্লম। গ্রামপ্রধান সহ সবার পরনে মিনি স্কার্টের মত মোটা কাপড়ের লুঙ্গি। মাতাঙ্গার সঙ্গে অস্ত্র বলতে গলায় ঝোলানো একটা ছুরি। শিকারীদের সঙ্গে আমরা পাহাড় থেকে নেমে জঙ্গলের দিকে হাঁটতে লাগলাম। বৃদ্ধ মাতাঙ্গাকে যতই দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি। মানুষ ছুরি ঝুলিয়ে রাখে কোমরে কিন্তু আট ইঞ্চি ফলার হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা দু' ধারী ছুরিটাকে সে সবসময় গলায় ঝুলিয়ে রাখে। মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে কী যেন বলে ছুরিটা হাতে নিয়ে। হাঁটার সময় বড় অদ্ভুত লাগে তাকে। একদিকে দুলতে থাকে মাথায় পেছনের বিশাল বেনী, অন্যদিকে গলায় ঝোলানো চামড়ার খাপে ভরা লম্বা ছুরি। শিকারীদের সঙ্গে আমরা এসে থামলাম একটা ঘাসের জঙ্গলের ধারে। এর দু' দিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা, বাকি দু' দিক সমতল ভূমি। শিকারীদের ধারণা, এই ঘাসের জঙ্গল বিট করলেই মাউস ডিয়ার বেরিয়ে আসবে। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো জঙ্গলের একপাশ থেকে শিকারীরা সারিবদ্ধভাবে চিৎকার করতে করতে সামনের দিকে এগিয়ে আসবে।

চান্দু

পা টিপে টিপে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন প্রফেসর জুনায়েদ। তাঁর মাথায় উপর সারি সারি ঝাঁকড়া ডালপালা, পায়ের নিচে স্যাঁতস্যাঁতে মাটি। প্রফেসরের দৃষ্টি চল্লিশ গজ দূরে জঙ্গলের ভেতর বিচ্ছিন্নভাবে গজিয়ে ওঠা একখণ্ড বাঁশঝাড়ের গুঁড়ির দিকে। সাবধানী পায়ে এগিয়ে যেতে যেতে এক সময় বাঁশঝাড়ের গুঁড়ির কাছে পাখির বাসার মতো একটা বাসা চোখে পড়লো। বাসার মালিকও বসে আছে তাতে। হৃদকম্পন বেড়ে গেল প্রফেসরের, দ্রুত হাতে টেলিলেন্স লাগানো ক্যামেরার ভিউফাইন্ডার তুলে আনলেন চোখের কাছে। আলো অনুযায়ী সাটার স্পীড আর এপারচার সেট করে রেখেছেন আগেই। ভিউফাইন্ডারে চোখ রেখে টেলিলেন্সের ফোকাসিং রিং ঘুরিয়ে ফোকাস ঠিক করে খটাখট টিপে গেলেন ক্যামেরার শাটার। শাটারের শব্দে মাথা তুলে তাকালো বাসার মালিক। এবার প্রফেসর দ্রুত বেগে আরো কিছু ছবি তুলে ফেললেন। ছবি তোলা শেষ করে পরিতৃপ্ত নয়নে তিনি তাকিয়ে রইলেন বাসা আর বাসার মালিকের দিকে। এই মুহূর্তে বাসা সহ তিনি যার ছবি তুললেন তাকে সমস্ত পৃথিবীর সর্প জগতের জীবন্ত কিংবদন্তী বলা হয়ে থাকে। আকারের দিক দিয়ে এরা হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম বিষধর সাপ।

আমাদের দেশে এই সাপ রাজ গোখরা, পদ্ম গোখরা, শঙ্খচূড়, কিং কোবরা ইত্যাদি নামে পরিচিত। অনেকের কাছে এরা সর্পভুক নামেও পরিচিত। কারণ এদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে সাপ। বিষধর আর নির্বিষ দুধরনের সাপই এরা খেয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, অনেক সময় ক্ষুধার তাড়নায় এক কিং কোবরা আরেক কিং কোবরাকে গলাধঃকরণ করে ক্ষুধা নিবারণ করে থাকে।

একটি পূর্ণ বয়স্ক কিং কোবরা আঠারো ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। আকারে বড় হওয়ায় এদের বিষের থলিও বড়। এদের কামড়ে বিশাল হাতি পর্যন্ত কয়েক মিনিটের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সাপের জগতে একমাত্র কিং কোবরাই ডিম পাড়ার আগে পাতা-লতা দিয়ে মাটির উপর বাসা তৈরি করে। কিং কোবরা সম্পর্কে এসব কথা ভাবতে গিয়ে বারবার পুলকিত হয়ে উঠলো প্রবীণ প্রাণীবিজ্ঞানীর মন। দুর্লভ প্রজাতির বন্যপ্রাণী, পাখি আর সরীসৃপের ছবি তোলাই তার একমাত্র নেশা। কিং কোবরার ছবি তোলার জন্য এ পর্যন্ত দেশের বহু স্থানের ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। অবশেষে সিলেটের এই লাওয়াছড়া জঙ্গলে এসে কিং কোবরার দেখা পেলেন। শুধু কিং কোবরা নয়, নিজের বাসা আর ডিমের উপর কুন্ডলী পাকিয়ে বসে আছে ফনা তোলা কিং কোবরা।

প্রফেসরের জানামতে, আজ পর্যন্ত কোন প্রাণীবিজ্ঞানী বা ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার বাংলাদেশ থেকে এ ধরনের ছবি ভুলতে পারেনি। তার কাছে মনে হল, আজ তিনি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কয়েকটি ছবি তোলার সুযোগ পেয়েছেন। নিজের বাসা

আর ডিমের উপর আগের মতই ফণা তুলে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে কিং কোবরা। ছবি তোলা শেষ হওয়ার পর প্রফেসর বাংলোয় ফিরে যাওয়ার কথা ভাবলেন। বিরক্ত দৃষ্টি নিয়ে বাসায় বসা কিং কোবরা তাকিয়ে রইল প্রফেসরের দিকে। এতে অবশ্য প্রফেসর ভয় পেলেন না। কারণ সাপ থেকে তার অবস্থান এখনও বেশ দূরে আর কিং কোবরার আক্রমণের গতিও তার জানা আছে। ফণা তোলা কিং কোবরার দিকে তাকিয়ে মনে মনে হাসতে হাসতে যখন প্রফেসর দেহ ঘুরিয়ে অন্যদিকে যাবার কথা ভাবলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি তার পেছন দিক থেকে শুনতে পেলেন গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ। ঠান্ডা একটা ভয়ের স্রোত নেমে গেল প্রফেসরের শিরদাঁড়া বেয়ে।

মারাত্মক ভুল করে ফেলেছেন তিনি।

কিং কোবরার বাসার দিকে এগুতে গিয়ে একবারের জন্যেও তার মনে আসেনি বাসায় বসা স্ত্রী সাপের চারদিকে সব সময় সতর্ক সৃষ্টি রেখে ঘুরে বেড়ায় পুরুষ কিং কোবরা। নিজের ভুলই এখন তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পেছন দিকে তাকানোর সাহস পেলেন না প্রফেসর। গভীর নিঃশ্বাসের মতো ফোঁস ফোঁস শব্দটা ক্রমেই বাড়তে লাগলো।

প্রায় চোদ্দ ফুট লম্বা কিং কোবরার ফণা মাটি থেকে পাঁচ ফুট উপরে উঠে এসেছে। মাত্র দুই হাত দূরেই নিশ্চিত মৃত্যু! বাঁচার আর কোনো আশা নেই। তার পরেই হঠাৎ সাপের ফণাটা সোজা নেমে এলো তার বুকের দিকে। তীব্র ছোবলের আঘাত অনুভব করার আশায়, আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেলো তার দু'চোখের পাতা। কতক্ষণ মৃত্যু আঘাতের অপেক্ষায় চোখ বন্ধ করে রেখেছিলেন, তার মনে নেই। নিজের গায়ে অন্য একটি স্পর্শ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুকে মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু কী আশ্চর্য! সাপের ছোবলের বদলে নিজের কবজিতে মানুষের হাতের স্পর্শ অনুভব করলেন। একটা হাতটা শক্ত করে চেপে ধরেছে তার কবজি। চোখ মেলতেই দেখলেন, ফলায় তীরবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে পুরুষ কিং কোবরা। অন্যটা বাসা ছেড়ে আক্রমণের ভঙ্গিতে সোজা ছুটে আসছে তাঁর দিকে।

ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি যেন বোবা হয়ে গেলেন। সমস্ত দুনিয়া যেন অন্ধকার হয়ে এলো তাঁর চোখের সামনে। সেই অন্ধকারে তিনি অনুভব করলেন তার হাতে চেপে থাকা মানুষের হাতটা দ্রুত গতিতে তাকে টেনে নিয়ে চলেছে জঙ্গলের দিকে। দৌড়াতে দৌড়াতে তিনি দেখলেন একটা ছোট আকারের মানবদেহ তাঁকে টেনে নিয়ে চলেছে। এক সময় দৌড় থামিয়ে ছোট দেহের মানুষটি ফিরে তাকালো তাঁর দিকে। বারো-তেরো বছরের এক সাঁওতাল বালকের চেহারা দেখতে পেলেন তিনি। তারপর দপ করে মাটিতে বসে পড়লেন। তাকে লক্ষ্য করে সাঁওতাল বালক হঠাৎ বলে উঠলো, "এমন আনমনা হয়ে রাজা সাপ-এর বাসার দিকে তাকিয়ে থাকা আপনার উচিত

দুঃসাহসী মুঙ্গীয়া

বাংলাদেশের উত্তর সীমান্তের অনেকটা জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে ছোট-বড় অসংখ্য পাহাড়। কয়েক শতাব্দী ধরে এসব পাহাড়ে বসবাস করে আসছে আদিবাসী গারো সম্প্রদায়ের লোকজন। তাই এ অঞ্চলের সবগুলো পাহাড় সমষ্টিগতভাবেই *গারো পাহাড়* নামে মানুষের কাছে পরিচিত। গারো পাহাড়ের বিস্তৃতি বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে ভারতের মেঘালয় রাজ্য পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। এই বিস্তৃর্ণ পাহাড়ী এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে শত শত গ্রাম।

গারো সম্প্রদায়ের ছয়টি গোত্রের মানুষ এসব গ্রামে বসবাস করে, 'চাঁদের টিলা' তেমনি একটি গ্রামের নাম। এই গ্রামে বসবাসকারী গারোদের গোত্রের নাম 'মারাক'। জুমচাষ আর শিকারের মাধ্যমে গ্রামের মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। গ্রামের স্ত্রীলোকেরা সারাদিন ফসল ক্ষেতের পরিচর্যা করে আর পুরুষেরা শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় জঙ্গলের গভীরে। গারোরা গ্রাম প্রধানকে বলে 'নকমা'। চাঁদের টিলা গ্রামের নকমা হচ্ছে মেরুয়া মারাক নামের এক সাহসী যুবক।

একদিন সন্ধ্যায় শিকার থেকে দু'জন শিকারী আর গ্রামে ফিরে এলো না। পরদিন মেরুয়া'র নেতৃত্বে দশজন শিকারী জঙ্গলে ঢুকলো নিখোঁজ শিকারীদের সন্ধানে। কিছু সময় ধরে তল্লাশী চালিয়ে তারা শিকারীদের পায়ের ছাপ খুঁজে বের করলো। এরপর সেই ছাপ অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে লাগলো উত্তরের দিকে।

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পায়ের ছাপ অনুসরণ করে মেরুয়া আর তার সঙ্গীরা এসে পৌঁছালো মেঘালয় পাহাড়ের পাদদেশের ইকড় বনের কাছে। ইকড় হচ্ছে মানুষের গলার সমান উঁচু এক ধরনের ঘাস। ইকড় বনের এই জায়গায় পাওয়া গেল একজন শিকারীর লাশ, এরপর কাছাকাছি এলাকা থেকে তারা খুঁজে বের করল অপর শিকারীর লাশ। দু'টো লাশই মারাত্মকভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে, প্রত্যেকের পাশে পড়ে আছে তাদের বল্লম আর চাল। বল্লমের ডগায় নেই কোন রক্তের ছাপ, অর্থাৎ মরার আগে একজন শিকারীও তাদের অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ পায়নি।

মেরুয়া আর তার সঙ্গীরা প্রথমে ভাবলো, শিকারীদের হত্যা করেছে একটা ক্ষ্যাপা হাতি। কিন্তু লাশগুলোর চারদিকের মাটিতে ভালো করে চোখ বোলাতেই বুঝলো, হত্যাকারী আসলে হাতি নয়। মাটির বুকে স্পষ্টভাবে লেগে আছে একটা বাইসন (গয়াল বা বনগরু)-এর খুরার ছাপ। পায়ের ছাপ দেখে বোঝা যায় বাইসনটা আকারে মোষের চাইতেও বড়, ওজন হতে পারে তিরিশ মণের কাছাকাছি। বাইসনরা সাধারণত দল বেঁধে চলাচল করে। সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী বাইসন দলের সর্দারী করে থাকে। মাঝে মাঝে দলের অন্য কোন বাইসন সর্দারের মতো বড় ও শক্তিশালী হয়ে উঠলে তার সঙ্গে সর্দারের বিরোধ দেখা দেয়। আর বিরোধের ফল হিসাবে এক সময় সর্দারের সঙ্গে তার মারাত্মক লড়াই আরম্ভ হয়ে যায়। সাধারণত এ ধরনের লড়াই শেষ হয় যেকোনো

একটি বাইসনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, আবার অনেক ক্ষেত্রে লড়াইয়ের সময় প্রতিপক্ষের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে কোনো কোনো বাইসন সোজা দৌড়ে পালিয়ে যায়।

এভাবে পালিয়ে যাওয়া বাইসন আর কখনো দলে ফিরতে পারে না। একা একা জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় এরা। সাধারণ বাইসনের চাইতে দলছুট বাইসন অনেক বেশি বদমেজাজী। কারণে অকারণে তারা জঙ্গলের জীব জানোয়ার হত্যা করে থাকে। মেঘালয় পাহাড়ের দুর্ভেদ্য জঙ্গলে বাইসনের একটা বড় দল বাস করে, তবে তারা কখনোই মেঘালয়ের সীমানা অতিক্রম করে গারো পাহাড়ে প্রবেশ করে না। তাই এদিকের শিকারীদেরকে বাইসনের মুখোমুখি হতে হয় না।

ইকড় বনে প্রচুর সম্বর হরিণ রয়েছে, দুই শিকারী হয়তো সম্বর শিকারের আশায় এখানে এসে হাজির হয়েছিল। তারা ভাবতেও পারেনি দ্বন্দ্ব যুদ্ধে হেরে যাওয়া একটা ক্ষ্যাপা বাইসন এখানে এসে আস্তানা গেড়েছে। শুধু এই কারণেই প্রাণ দিতে হল তাদেরকে।

মেরুয়া আর তার সঙ্গীরা শিকারীদের লাশ নিয়ে গ্রামে ফিরে এলো সন্ধ্যার একটু আগে। নিহতদের স্বজনদের কান্নার শব্দে ভারী হয়ে উঠলো চাঁদের টিলা গ্রামের বাতাস।

সেই রাতে গ্রামের সব শিকারীরা এসে হাজির হলো গ্রাম প্রধান মেরুয়ার কুটিরের সামনে। তারা সবাই কাল সকালে ইকড় বনে গিয়ে বাইসনটাকে হত্যা করে মৃত শিকারীদের হত্যার বদলা নিতে চায়। তাদের প্রস্তাব শুনে মেরুয়া মনে মনে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লো। কিন্তু মনের ভাব বাইরে প্রকাশ না করে সে তাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল।

পুব আকাশে ভোরের আলো ফুটে উঠার সঙ্গে সঙ্গে শিকারীদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। যার যার বল্লম ও ঢাল সঙ্গে নিয়ে সবাই এসে দাঁড়াল মেরুয়ার কুঠিরের সামনে। শিকারীদের প্রত্যেকে দুর্দান্ত সাহসী, তীর-ধনুক ব্যবহার করে দূর থেকে জন্তু-জানোয়ার হত্যা করাকে কাপুরুষতা মনে করে। শিকার বা প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই-এ তাদের প্রিয় অস্ত্র হচ্ছে বল্লম আর টাঙ্গী। কুঠিরের বাইরে হৈচৈ শুনে মেরুয়া তার পাঁচ বছর বয়সী ছেলে মুঙ্গীয়া'র দিকে তাকালো, পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে সে। বিছানায় ঘুমন্ত ছেলের কপালে একটা চুমো দিয়ে বউয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো।

গ্রাম থেকে বেরিয়ে সারিবদ্ধভাবে হেঁটে চললো শিকারীরা। সবার সামনে মেরুয়া। প্রত্যেকের হাতে বল্লম থাকলেও মেরুয়ার হাতে রয়েছে চকচকে বিশাল এক টাঙ্গী। এই টাঙ্গী গ্রামের সম্মানের প্রতীক, যুগ যুগ ধরে যে কেউ গ্রাম প্রধান নির্বাচিত হলে তা তুলে দেয়া হয় তার হাতে। জঙ্গলের সরু রাস্তা ধরে হাঁটতে গিয়ে মেরুয়া বার বার ভেবে চলেছে দলছুট বাইসনের কথা, এরা একদিকে যেমন ভীষণ শক্তিশালী অন্যদিকে ঠিক তেমনি ধূর্ত।

শেষ শিকার

বন্দুক চালানো শিখবার দু'বছর পরের কথা। শিকারের সন্ধানে একা একা ঘুরে বেড়াতাম বন-জঙ্গল, বিল-হাওরে। আবার মাঝে মাঝে বাপ-বেটা দু'জনে একসাথে শিকারে যেতাম। কখনও দিনে, আবার কখনও রাতে। একবার আমার শিকার যাত্রার উপর বাবা কয়েক মাসের নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। কারণ আমার এস. এস.সি. পরীক্ষার তখন মাত্র তিন মাস বাকি। কনকনে এক শীতের রাতে পড়ার টেবিলে বসে দেখলাম, বাবা শিকারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। মাথায় কাউবয় ক্যাপ আর গায়ে ভারী ওভারকোট চাপিয়ে হান্টিং টর্চ বাঁধা দো'নলা বন্দুক নিয়ে তিনি ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন। আমাকে না বললেও আমি ঠিকই জানতাম তিনি কোথায়, কী শিকারের জন্য যাচ্ছেন। তিনি যাচ্ছেন আমাদের বাড়ি থেকে কয়েক মাইল দূরের শীতলক্ষ্যা নদীর কাঁঠালিয়ার চরে। দুধ সাদা এই বালুচরের কিনারা জুড়ে শীতকালে গজিয়ে ওঠে এক ধরনের চিকন ঘাস। এই ঘাস বুনো রাজহাঁসদের খুবই প্রিয় খাদ্য। ঘাস খাওয়ার জন্য রাজহাঁসের ঝাঁক চরে নামে শেষ রাতের দিকে। যেসব জেলেরা রাত জেগে নদীতে মাছ ধরে, তারাই সবার আগে চরের বুকে হাঁসের দলের দেখা পায়। ঐ জেলেদের একজন যে বাবাকে বুনো রাজহাঁসের আগমন সংবাদ দিয়ে গেছে সেটা বুঝতে আমার তেমন কোন কষ্ট হলো না। কষ্ট হলো এই জন্য যে, নিজে তাঁর সঙ্গে যেতে পারলাম না।

বাবা চলে যাওয়ার পর আমার মন চলে গেল কাঁঠালিয়ার চরে। যেখানে বাবা আজ কোন চরকলমীর ঝোপের ভিতর বন্দুক হাতে ওঁৎ পেতে বসে থাকবেন। আকাশ থেকে প্লেনের মত মাথা নিচু করে একে একে নেমে আসবে বিশাল আকৃতির সাদা রঙের হাঁসগুলো। সারিবদ্ধ হয়ে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াবে। আর তখনই বাবার বুকের ভিতর শুরু হয়ে যাবে হাতুড়ি পেটার শব্দ। এসব ভাবতে গিয়ে পড়ার টেবিলে বেশিক্ষণ বসতে পারলাম না। শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম এলো না। সিনেমার পর্দার মত চোখের সামনে ভেসে ওঠা একের পর এক চিন্তায় ভেসে গেল মন। বাবা কী ধরনের গুলি সঙ্গে নিয়ে গেছেন? তিনি কি প্রায় এক সঙ্গে বন্দুকের দু'টো ট্রিগার টিপবেন? নাকি গুলি করবার সুযোগই পাবেন না? একেবারেই খালি হাতে সকালে ফিরে আসবেন বাড়িতে?

একেবারে শেষদিকে ঠিক কী চিন্তা করেছিলাম মনে নেই। ঘুম ভাঙতেই দেখলাম, সকালের আলো এসে পড়েছে আমার বিছানায়। ঘর থেকে বেরিয়ে দৌড়ে গেলাম রান্নাঘরের দিকে। রান্নাঘরে গিয়ে জানতে পারলাম, সকালে বাবা খালি হাতে ফিরে এসেছেন। বাবাকে তাঁর ঘরে পেলাম না। তাই বাড়িময় ছুটতে লাগলাম তাঁর খোঁজে। এক সময় তাঁকে দেখতে পেলাম বাড়ির আঙিনার পাশে। দাঁত ব্রাশ করতে করতে তাকিয়ে আছেন সামনের খোলা প্রান্তরের দিকে। তাঁর দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে তাঁকে কেমন যেন আনমনা মনে হলো আমার কাছে। গত রাতের শিকারের ব্যর্থতার খবর জানবার জন্য ভিতরে ভিতরে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম আমি। বাবার

পেছনে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে অনেকগুলো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে ফেললাম তাঁকে। আমার কথা শুনে হঠাৎ তিনি পেছন ফিরে তাকালেন আমার দিকে। তাঁর চোখের দৃষ্টি দেখে আমি আঁৎকে উঠলাম। এই কি আমার সেই বাবা, যে নিজ হাতে আমাকে যত্ন করে বন্দুক চালানো শিখিয়েছেন? শিকারের সফলতা আর ব্যর্থতার গল্প যিনি বরাবর হাসিমুখে আমার কাছে বর্ণনা করে এসেছেন? অত্যন্ত গম্ভীর মানুষ হওয়া সত্ত্বেও যিনি বেশির ভাগ সময় আমার সঙ্গে বন্ধুর মত আচরণ করেন, এই কি আমার সেই বাবা?

অপলক দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তাঁর চোখে ভেসে আছে প্রচণ্ড বিরক্তির ছাপ। তাঁর এ অদ্ভুত আচরণে প্রথমে আমি ভীষণ অবাক হলাম, এরপর পেলাম ভয়। আমার সঙ্গে কোনো কথা না বলে তিনি বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলেন। মাথা নিচু করে আমিও হেঁটে চললাম তাঁর পেছনে পেছনে। নাস্তা খেয়ে বাবা চলে গেলেন চেম্বারে। আর সারাদিন ভিতরে ভিতরে ছটফট করলাম আমি।

গত কয়েক দিনের কাজকর্ম সম্পর্কে বারবার ভাবলাম। আমি এমন কোনো কাজ করিনি, যাতে বাবা আমার উপর রাগ করতে পারেন। তবে কেন তিনি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করলেন? সেদিন সন্ধ্যায় বাবা আমার ঘরে এলেন। ঘণ্টা খানেক বসে আমাকে ইংরেজী গ্রামার পড়ালেন। তাঁর আচরণ, কথাবার্তা সম্পূর্ণ আগের মত। কোথাও রাগ বা বিরক্তির প্রকাশ খুঁজে পেলাম না। একবার সাহস করে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম গত রাতের শিকারের কথা। পরক্ষণেই আমার মনে পড়ে গেল সকাল বেলায় দেখা তাঁর চোখের সেই শীতল চাহনির কথা। সাহস হারিয়ে চুপ মেরে রইলাম।

এরপর কেটে গেল প্রায় একটি মাস। আমার পরীক্ষার দিন ক্রমেই ঘনিয়ে আসতে লাগল। সে সময় হঠাৎ আমাদের গ্রামে দেখা দিল এক পাগলা শেয়ালের উৎপাত। একের পর এক শেয়ালের কামড়ে রোগী আসতে লাগল বাবার চেম্বারে। গ্রামবাসীরা তাঁকে অনুরোধ করল, পাগলা শেয়ালটা মেরে দেওয়ার জন্য। তিনি বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে অনুরোধ এড়িয়ে গেলেন। গ্রামবাসীদেরকে তিনি বললেন থানায় খবর দেওয়ার জন্য। থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে পাগলা শেয়ালটাকে গুলি করে মারবে। আমাদের গ্রাম থেকে থানার দূরত্ব অনেক। আর থানায় এই খবর নিয়ে গেলেও, চোর-ডাকাত ধরা বন্ধ করে পুলিশ একটা পাগলা শেয়াল মারতে ছুটে আসবে— এমন ঘটনা আশা করাও বোকামি। সেদিন বাবার কথায় গ্রামবাসীরা যেমন ক্ষুব্ধ হয়েছিল, তেমনি আমি হয়েছিলাম বিস্মিত। দিন দিন বাবার মধ্যে কেমন যেন একটা পরিবর্তন দেখতে পেলাম শিকারের ব্যাপারে। যে মানুষ কৃষকের ফসল রক্ষার জন্য বহু রাত ঝোপ-জঙ্গলে কাটিয়েছেন বুনো শুয়োরের অপেক্ষায়, মৃত্যুর পরোয়া না করে রাতের আঁধারে বহু বার যিনি ছুটেছেন ভয়ংকর চিতাবাঘের পেছনে, সে মানুষ আজ কেন নীরব ভূমিকা পালন করেছেন? প্রতিবেশীদের বিপদের দিনে আজ কেন তিনি নিশ্চুপ?

একদিন খুব ভোরে মানুষের হট্টগোলে আমার ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা থেকে নামতে গিয়ে চোখ পড়ল দরজার দিকে। বন্দুক হাতে বাবা এসে দাঁড়ালেন আমার